গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা | ৯ - ১৫ জুন ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি
মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট

ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার দায় প্রধানমন্ত্রীকেই নিতে হবে

বালেশ্বরের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ভারতীয় রেল ব্যবস্থার ভেতরের ভেঙে পড়া অবস্থাটাকে একেবারে নগ্ন করে দিল। তবে সেই চেহারা সামনে এল প্রায় চারশো মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং হাজারের বেশি মানুষের পঙ্গুত্বের বিনিময়ে। প্রধানমন্ত্রী থেকে রেলমন্ত্রী সকলেই তাঁদের শাসনে রেল ব্যবস্থার কী বিরাট উন্নয়ন হয়েছে তাঁর লম্বা ফিরিস্তি সুযোগ পেলেই দেশের মানুষকে শুনিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে সপ্তাহে গড়ে দুটি করে বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করে চলেছেন। প্রচারের সবটুকু আলো শুধুমাত্র নিজের উপরই যাতে পড়ে তার জন্য রেলমন্ত্রী বা অন্য কাউকে এ মহান কাজটি তিনি করতে দেন না। প্রতিবারই কখনও দীর্ঘ, কখনও নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় ডিজিটাল ভারত, গতিশীল ভারতের গল্প শোনান। গত এক বছর ধরে রেলের খবর মানে শুধুই বন্দে ভারত। অথচ দেশের রেল ব্যবস্থার সিংহভাগ যে এক্সপ্রেস, সুপার এক্সপ্রেস বা লোকাল ট্রেনগুলি, সেগুলির দুরবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা দেশের মানুষকে জানতেও দেন না। যাঁরা এই ট্রেনগুলিতে নিত্য যাতায়াত করেন একমাত্র তাঁরাই এই নরকযন্ত্রণার সাক্ষী। যখন এই রকম কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তখনই একমাত্র দেশের মানুষ জানতে পারে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে ভারতীয় রেল ব্যবস্থা।

ঘটনাস্থলে এসইউসিআই(সি) নেতৃবৃন্দ

৩ জুন দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যান এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধি দল

এই মুহূর্তে রেলে প্রায় ৩ লক্ষ পদ খালি। এর মধ্যে একটা বড় অংশই নিরাপত্তা সংক্রান্ত। ট্রেন চালকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকায় নিয়ম ভেঙে বহু সময়ই চালকদের ১২ ঘণ্টার বেশি ডিউটি করানো হয়। কখনও প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে টানা ডিউটি করানো হয়। এই দায়িত্বে

পাঁচের পাতায় দেখুন

স্মরণে শোক

ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা সরকারি হিসাবেই ৩০০-র কাছাকাছি, আহত অসংখ্য। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শোকবেদি স্থাপন করে মাল্যদান, নীরবতা পালন ও কালো ব্যাজ ধারণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তিনি প্রত্যেকের বন্ধু পরিচিতদেরও শোকবেদিতে ফুল দেওয়ার জন্য আবেদন করার কথা বলেন। দুর্ঘটনার তদন্ত, দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যাত্রী পরিষেবা সহ রেলব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রে বেহাল

পাঁচের পাতায় দেখুন

তৃণমূল সরকার
সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করছে

রাজ্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে 'ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম' অনুযায়ী চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের যে ব্যবস্থা আছে তা কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে। গত ৩১ মে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই মোতাবেক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা শুরু করল।

তৃণমূল সরকার নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে বিজেপির বিরুদ্ধে নানা কথা বললেও জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বিরোধিতা দূরে থাক, অনেকটা আগ বাড়িয়ে তাকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছে। শিক্ষা যেহেতু যুগ্ম তালিকায় আছে, প্রশ্ন উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল রাজ্য সরকার, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে হামেশাই নানা তর্জন-গর্জন করে, জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশ্নে তার ভূমিকা কী হবে। এই প্রশ্ন বারবার ওঠায় তৃণমূল সরকার বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কয়েক বছরের ব্যবধানে দুটি কমিটি তৈরি করে। ভাবখানা এমন, তাঁরা জাতীয় শিক্ষানীতি মানেন না, তাই বিকল্প নীতির খোঁজ। পার্থ চ্যাটার্জি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার রিপোর্ট দেখার সুযোগ কারও হয়নি। ব্রাত্য বসু মন্ত্রী হয়ে দ্বিতীয় একটি কমিটি করলেন, দেশ-বিদেশের অনেক দর-ভারওয়ালা লোকজনকে তার সদস্য করা হল। কিন্তু সরকারি অর্থের অঢেল অপচয়ের বিনিময়ে কোনও বিকল্প নীতির সন্ধান তাঁরা পেলেন কিনা তা করদাতারা জানতে পারলেন না, বারবার দাবি উঠলেও তাঁরা জনসাধারণকে তা জানানোর প্রয়োজন বোধ

দুয়ের পাতায় দেখুন

অধ্যাপকদের রিফ্রেশার কোর্সের বিষয়বস্তু ও ইউজিসি-র পরিকল্পনা ন্যক্কারজনক

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ৫ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে দেশের ৬৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিফ্রেশার, উইন্টার বা সামার স্কুল, শর্ট টার্ম কোর্স, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির জন্য ইউজিসি যেসব বিষয় নির্ধারন করেছে এক কথায় তা নজিরবিহীন। এই কোর্সে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ুয়া হিসাবে যোগ দেবেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কেই 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'-এর উপর ওয়ার্কশপ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষক মহলে 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম' অত্যন্ত বিতর্কিত ও অপবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির কেন্দ্রবিন্দু।

'অনলাইন কোর্স'-এর ডিজাইন কী ভাবে করতে হবে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শেখাবে। কেমন করে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে হবে তার পাঠ বহু বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। শিক্ষার উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন কেমন করে বাস্তবায়িত করতে হবে তার উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। সব থেকে বিস্ময়ের দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের বিষয়বস্তু। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন অনেক বেশি। কিন্তু 'হিন্দু স্টাডিজ' ও 'বৈদিক দর্শন ও বিজ্ঞান'-এর উপর পাঠ দেওয়ার দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই বর্তেছে!

একটি স্বশাসিত সংস্থার নামে ইউজিসি-কে যে ভাবে সঙ্ঘ পরিবারের শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণে ব্যবহার করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তা অত্যন্ত আপত্তিজনক। অধ্যাপক সংহতি মঞ্চ এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রিফ্রেশার কোর্সে এই ধরনের বিষয়গুলিকে প্রত্যাখ্যানের দাবি জানায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করছে

একের পাতার পর

করেননি। অবশেষে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। গত ১৭ মার্চ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি দিয়ে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করল, আবারও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করল এবং ৩১মে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকারিভাবে চালু করে দিল। এর মাধ্যমে তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরি করা শুরু করল। ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার মাধ্যমে এই প্রথম স্পষ্ট হল, এই সরকার জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতিরই পক্ষে এবং তা তাঁরা চালুও করবেন।

নতুন এই ব্যবস্থায় কী থাকছে

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজে স্নাতক স্তরে (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেলের মতো পেশাগত বিষয় ছাড়া) জেনারেল বা অনার্স পড়তে এতদিন তিন বছর লাগত। এখন থেকে অনার্স পড়তে গেলে চার বছর লাগবে। কিন্তু এছাড়াও অনেক কথা আছে। যেমন, কেউ এক বছর বা দুই সেমিস্টার পাশ করে যদি পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে সে একটি সার্টিফিকেট পাবে। যদি দুই বছর বা চার সেমিস্টার পাশ করে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। তিন বছর বা ছয় সেমিস্টার সম্পূর্ণ করে ছেড়ে দেয় তাহলে সে স্নাতক ডিগ্রি পাবে। আর যে চার বছর বা আট সেমিস্টার পাশ করবে, তাকে চার বছরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্নাতকের অনার্স শংসাপত্র দেওয়া হবে এবং যে এর সঙ্গে গবেষণা করবে তাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্নাতকের (গবেষণা সমেত অনার্স) শংসাপত্র দেওয়া হবে। শেষেরটির গুরুত্ব সব থেকে বেশি হবে এবং সেই পড়ুয়া এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তাহলে বাকি সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা কেবল স্নাতক ডিগ্রিধারীদের ভবিষ্যৎ কী হবে? অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনার হাত ধরে পাঁচ ধরনের নাগরিক সৃষ্টির ব্যবস্থা হল।

আবার সব থেকে বেশি কৌলীন্যের শিরোপা নিয়ে যাঁরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোবেন তাঁদের অবস্থা দেখুন। তাঁদের হাতে থাকবে 'মাল্টিডিসিপ্লিনার' নামক গালভরা খেতাব। এর মানে হল, তাঁরা ছাত্রাবস্থায় প্রভূত স্বাধীনতা পেয়েছেন, যার বলে প্রথম বছর পাঠ্য বিষয়গুলি যে কম্বিনেশনে পড়েছেন, দ্বিতীয় বছর আর একটি কম্বিনেশনে পড়েছেন, তৃতীয় বছর অন্য আর একটি কম্বিনেশনে। যেমন, প্রথম বছর হয়ত পদার্থবিদ্যা ও ফ্যাশান ডিজাইন, দ্বিতীয় বছর অর্থনীতি ও রসায়ন, তৃতীয় বছর বাংলা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনও মিলমিশ নেই— সম্পর্কহীন, সংযোগহীন কিছু বিষয়, যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান গড়ে ওঠার কোনও সুযোগ নেই এবং যা বিদ্যার্থীর মনে যুক্তিবাদী মানসিকতা, মননশীলতার বিকাশে কোনও সাহায্য করবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে বিষয়ের কম্বিনেশন নিলে নম্বর বেশি উঠবে তাই নেওয়ার প্রবণতা কাজ করবে। তাতে হয়ত নম্বর বেশি উঠবে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন হবে কি? এঁরাই হবেন বিজেপি-র দাবি অনুযায়ী তাঁদের পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল। পড়ুয়াদের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের এমন অদ্ভুত স্বাধীনতা প্রদানকে তাঁরা 'বিদ্যার্থী-কেন্দ্রিক' শিক্ষা ব্যবস্থা বলছেন এবং দাবি করছেন, এমন ব্যবস্থা নাকি এর আগে কোনওদিন হয়নি। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় বিদ্যার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি ধারণা আছে, তার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএস এর মস্তিষ্কপ্রসূত এই পরিকল্পনার কোনও সম্পর্ক নেই। স্বাধীনতা দেওয়ার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে তাঁদের অমানুষ করার এটা এক গভীর ষড়যন্ত্র। প্রশ্ন হল, এতগুলো কম্বিনেশনে পড়ে তিনি যে বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি পাবেন, সেই বিষয়ে তাঁর কি জ্ঞানের গভীরতা সৃষ্টি হবে?

আর একটি বিষয় আছে যা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও উচ্চশিক্ষায় যতটুকু শৃঙ্খলা আছে তাকে বিপর্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তা হল 'মাল্টিপল এন্ট্রি' ও 'মাল্টিপল এক্সিট' এবং 'অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট'। এর অর্থ হল, একজন পড়ুয়া এক কলেজে কিছুদিন পড়ে ক্রেডিট সংগ্রহ করে সেই কলেজ ছেড়ে আর এক কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। সেখানে কিছুদিন পড়ে ক্রেডিট সংগ্রহ করে আর এক জায়গায় ভর্তি হতে পারবেন। এমন করে যাওয়া-আসা করতে করতেই চার বছরের কোর্স সর্বোচ্চ সাত বছর সময়ে সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মাঝের বছরগুলোতে যে ক্রেডিট অর্জন করবেন তা উক্ত অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটে জমা হতে থাকবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রেডিট সংগ্রহ হলেই তিনি ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। যে কলেজগুলোতে তিনি ভর্তি হবেন তা দেশ জুড়ে যে কোনও জায়গায় থাকতে পারবে। এর মানে কিন্তু এই নয় যে কোনও ছাত্র নতুন কোনও অনামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছর পড়ে দ্বিতীয় বছর কলকাতা, যাদবপুরের মতো কোনও সামনের সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন। তা নির্ভর করবে আসন খালি থাকা না থাকার উপর। প্রশ্ন হল, তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবেন?

দক্ষতা বা স্কিল সৃষ্টি করা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না

এখানেই শেষ নয়। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নয়— ছাত্রদের মধ্যে দক্ষতা বা স্কিল সৃষ্টি করা। তার জন্য উক্ত শিক্ষার্থীদের মাঝেমাঝে স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি কিছু থাকে বা হাতের কাজ যাঁরা করেন তাদের কাছে ইন্টার্নশিপ করতে পাঠানো হবে। তাতে নাকি তাদের শিক্ষান্তে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতার বিকাশ হবে! লাখ লাখ ডিপ্লোমা ও গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার যেখানে বেকার, তাতে এই স্কিল দিয়ে চাকরি পাওয়ার কি সুবিধা হবে? রসিকতারও একটা সীমা থাকা উচিত! পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর, ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে মধ্যযুগীয় ভাবধারার জাবর কাটা, অনলাইন, দূর-শিক্ষা, অফলাইন, হাইব্রিড, ব্লেন্ডেড বা মিশ্রপদ্ধতি যে কোনওভাবেই বিদ্যার্জনের সুযোগ— এই হল নতুন ব্যবস্থার অভিনব আরও কিছু দিক। এত কিছুর সারমর্ম হল, এই স্নাতক কোর্স চার বছরের— তার মধ্যে যে কোনও বছরে ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে এবং তদনুযায়ী সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে, খেয়াল-খুশি মতো কলেজ ছেড়ে দিয়ে অন্য যেকোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যাবে, প্রতি বছর পাঠ্য-বিষয় পরিবর্তন করা যাবে। এমন আজগুবি ব্যবস্থাকে তাঁরা নজিরবিহীন বলে দাবি করছেন। আসলে এমন স্বাধীনতা দেওয়ার (পড়ুয়া-কেন্দ্রিক) নামে তাঁদের কেরিয়ারে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হবে, তা হবে নজিরবিহীন। কিছু না-শেখা, না-জানা, নম্বর-সর্বস্ব এক শ্রেণির অনার্স ডিগ্রিধারীর জন্ম হবে যাঁরা না পাবেন চাকরি, না পারবেন স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতে, গবেষণা করার যোগ্যতাও কার্যত তাঁদের থাকবে না। অন্যদিকে স্নাতক স্তরের কলেজ ও অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়া ভর্তির অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে, কারণ কোনও ছাত্র কখন ভর্তি হবে এবং কখন ছেড়ে যাবে তার নিশ্চয়তা থাকবে না। তার উপর চার বছরের জন্য যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে তা কোথা থেকে আসবে, তার আর্থিক দায়িত্ব কে নেবে সে ব্যাপারে কলেজগুলি খুবই শঙ্কিত। আমাদের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধুই 'নেই-নেই'-এর রাজ্যে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হবে। সরকার পোষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে ঝুলবে বিলুপ্তির অশনি সংকেত। অভিভাবকরা দৌড়োবেন তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে মহার্ঘ বেসরকারি কলেজের আঙিনায়। শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্য প্রস্তুত থাকবে লাল-গালিচা অভিবাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

শ্রেণি-কক্ষের পরিবর্তে অনলাইন বা প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রকৃত মানুষ তৈরির পথে বাধা

প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই শিক্ষানীতি অনলাইন শিক্ষার উপর

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

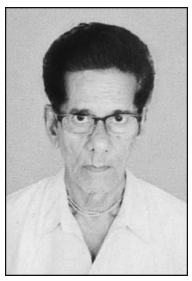

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার কুলপী থানার অন্তর্গত রামকিশোরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামরামপুর গ্রামের এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ সদস্য কমরেড গোলক মণ্ডল ১৫ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৭০ সাল নাগাদ কমরেড নলিনী প্রামাণিকের সান্নিধ্যে এসে কমরেড মণ্ডল এস ইউ সি আই (সি)-র চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ধীরে ধীরে তিনি নানা গণআন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং দলের সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হন।

কুলপী বিধানসভার বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে দলের বিস্তার না থাকলেও তিনি একাই তৎকালীন ক্ষমতাসীন সিপিএমের পেশিশক্তি ও বর্তমান শাসক দলের প্রবল বাধা ও অত্যাচার উপেক্ষা করে দলের কাজ করতে থাকেন। এমনকি পুকুরে বিষ ঢেলে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলেও তাঁকে দমানো যায়নি। বাসের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে এবং কুলপী বন্দর গড়ার উদ্যোগ শুরু হলে এলাকার মানুষের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ নেন।

মার্চ মাসে জয়নগরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করাকালীন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হলে বাড়িতে পাঠানো হয়। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি দলের কাজ বন্ধ করেননি। যেদিন মারা গেলেন সেদিনও জনসংযোগ করতে গিয়ে ঝড়ের মুখে পড়েন ও পুনরায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাস্তাতেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় দলের সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হল।

কমরেড গোলক মণ্ডল লাল সেলাম

অগ্নিদগ্ধ মণিপুর

৩ জুন, মণিপুরের জাতিদাঙ্গা শুরু হওয়ার ঠিক একমাস পর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে দুই সাংবাদিক দেখেছেন, মণিপুরে পাহাড়বাসী কুকি, জো, ইত্যাদি আদিবাসী এবং উপত্যকাবাসী মেইতেইদের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ এতটাই গভীর যে, সে রাজ্যে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মচারী, অধ্যাপক, শিক্ষক সকলে এমন জায়গায় বদলি হতে চাইছেন যেখানে নিজের জাতিগত (এথনিক) জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত আধিপত্য আছে। এমনকি মণিপুর রাজ্য পুলিশের অফিসার হয়েও জাতিগত পরিচয়ের কারণে একমাস ধরে রিলিফ ক্যাম্পে দিন কাটছে এমন উদাহরণও কম নয়।

মণিপুরের পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা আদিবাসী মূলত কুকি জনগোষ্ঠী এবং উপত্যকাবাসী মেইতেইদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ৩ মে। একমাস পার করেও প্রতিদিন খবর আসছে দাঙ্গা, আগুন লাগানো, লুঠপাটের। মানুষের প্রশ্ন এর শেষ কোথায়? ইতিমধ্যে সরকারি হিসাবেই মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে রিলিফ ক্যাম্পে অথবা অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে হাজারের বেশি। এর পরেও কোথায় পরিস্থিতি গড়াবে কেউ বলতে পারছে না। যদিও এই অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা হয়ে উঠে এসেছেন বিবাদমান দুইপক্ষের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিশেষত মহিলারা, যাঁরা অন্য জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত মানুষের প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও এগিয়ে এসেছেন। আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আসাম থেকে এসইউসিআই(সি)-র স্বেচ্ছাসেবকরা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মণিপুরে ক্যাম্প করেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবকরা ইম্ফল সহ একাধিক জায়গায় চিকিৎসা শিবির করেন।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা

প্রশ্ন উঠেছে জাতিদাঙ্গা শুরুর আগেই তা আটকাতে কিংবা শুরু হওয়ার পর তা থামাতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার কী করেছে? তারা যে কার্যত কিছুই করেনি এতদিনে তা সারা দেশের জানা হয়ে গেছে। সরকার দাঙ্গা অটকাবে কি— সরকারি অস্ত্রাগার থেকেই চার হাজারের বেশি আধুনিক অস্ত্র লুঠ হয়ে গেছে। পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী তা রুখতে প্রায় কোথাও কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। সরকার না চাইলে বাহিনী কি এমন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারত? মণিপুর যখন প্রতিদিন রক্তে ভাসছে, তখন সমস্যা সমাধানে দ্রুত ছুটে যাওয়ার বদলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দীর্ঘ সময় ব্যস্ত ছিলেন কর্ণাটকের ভোটে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে। পরেও তাঁদের মুখে এ প্রসঙ্গে কার্যকরী কিছু শোনা যায়নি। অবশেষে প্রায় একমাস পর দেশ জুড়ে সমালোচনার ধাক্কায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গাত্রোত্থান না করে পারেননি। তিনি মণিপুরে চারদিন কাটিয়ে যে সব বাণী দিয়েছেন তার মোদ্দা কথা হল সরকার তদন্ত কমিশন করবে। রাজ্য পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা এবং অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ নিয়ে রাজ্যের মানুষের যে প্রবল ক্ষোভ, তা বুঝেই তিনি তদন্তের নামে কালক্ষেপ করতে চেয়েছেন। পরিস্থিতি এমন যে পুলিশের যে কাজ করার কথা তা তিনি নিজের ঘাড়ে নিয়ে জনগণের কাছে আবেদন করেছেন, লুঠ করা অস্ত্র জমা দিন। যদিও তারপর এক সপ্তাহে মাত্র শ'দেড়েক অস্ত্র ফেরৎ এসেছে বলে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। মণিপুর হাইকোর্টের যে রায় দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে সমালোচিত হয়েছে তাকে তিনি তাড়াহুড়োর রায় বলেছেন। মণিপুরের নাগরিক সমাজের সাথে কথা বলার প্রয়োজনবোধ তাঁর অবশেষে জেগেছে— কিন্তু সবটাই বড় দেরিতে! তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী যেমন চুপ করে বসে ছিলেন, তেমনই তাঁর দলের রাজ্য সরকারও দাঙ্গা যেন চলতেই দিয়েছে। অমিত শাহের অতীত উদ্ধৃতি, 'ক্রোনোলজি সমঝিয়ে' স্মরণ করে সন্দেহ হয় আসলে বিজেপি নেতৃত্ব এই অশান্তি চলতে দিতেই চেয়েছে।

২৭ মার্চ মণিপুর হাইকোর্টের এক বিচারপতির বেঞ্চ যখন সে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মেইতেইদের তফশিলি জনজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়, সরকার কি তার পরিণাম জানত না? তাহলে রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা হাইকোর্টে সঠিক ভূমিকা নেননি কেন? এমনকি সুপ্রিম কোর্টও বলেছে, হাইকোর্টের মামলায় আইনজীবীরা সঠিক ভূমিকা নিলে তাঁরাই আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিতেন, এই রায় তার এক্তিয়ারের বাইরে যাচ্ছে (দ্য টেলিগ্রাফ, ৮.০৫.২০২৩)। দেখা গেল রায়ের পর এক মাসের বেশি সময় রাজ্য এবং কেন্দ্রের 'ডবল ইঞ্জিন' বিজেপি সরকার কার্যত যেন জাতিদাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করেই ছিল! হানাহানি ছড়িয়ে পড়ার অনেক পরে সরকার যত দিনে নড়ে বসেছে, তত দিনে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টে মণিপুরের জনজাতি সংগঠন অভিযোগ জানিয়েছে যে, বিজেপি সরকারের জন্যই 'এথনিক ক্লিনসিং' বা জাতিগতভাবে একটি অংশের জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে দাঙ্গা ছড়াতে পেরেছে।

বেশ কিছুদিন ধরে বিজেপির রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে পাহাড়ে এবং বনাঞ্চলে মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী খোঁজার অছিলায় ভারতীয় নাগরিক আদিবাসীদেরও স্বাভাবিক এবং আইনগত অধিকার দিতে অস্বীকার করছে। তারা বহু গ্রাম উচ্ছেদ করার কাজ শুরু করেছে। সংবিধানের ৩৭১-সি ধারা এবং আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি অকেজো করে রেখে অধিকাংশ বনাঞ্চলকে 'রিজার্ভ ফরেস্ট' ঘোষণা করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করতে অভিযান চলছে। মূলত কুকি জনজাতিদের বেশ কিছু গ্রাম সরকার উচ্ছেদ করেছে বা উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। এ সবের ফলে পাহাড়ি জনজাতিদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ ও ক্ষোভ দানা বাঁধছে। এ কথা ঠিক যে, এই সমস্ত এলাকায় দারিদ্র এবং অন্য পেশার সুযোগের অভাবে আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষ পোস্ত চাষে আকৃষ্ট হন। জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে সরকার যেমন সাধারণ মানুষকে বিকল্প রোজগারের রাস্তা দেখাতে পারত, তেমনই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে একে ঘিরে চলা ড্রাগ ব্যবসা দমন করে এই চাষকেই প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি ও অন্য অর্থকরী ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারত। তা না করে জনজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার কাজে পোস্ত চাষ বন্ধকেই অজুহাত করেছে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। এই পার্বত্য জনজাতিগুলির মধ্যে বহুদিন ধরেই সমতল এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে বিচ্ছিন্নতাবোধ আছে। এই বিচ্ছিন্নতার মূলে আছে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথেও তাদের বিচ্ছিন্নতা। জাতীয় নেতারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে এদের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার চেষ্টা করেননি। বরং নানা অছিলায় দমন পীড়ন চালিয়েছেন। স্বাধীনতার পর ঐতিহ্যগত এই শূন্যতাকে ভারতীয় পুঁজিবাদ তার রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংকট বর্তমান সংকটের পশ্চাদভূমি হয়ে রয়েছে।

একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস হিসাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার দুই দল শোষিত মানুষের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ জিইয়ে রাখতেই চেয়েছে। যাতে তারা মানুষের ওপর দমন পীড়ন চালানোর 'নৈতিক ছাড়পত্র' পেয়ে যেতে পারে। ফলে মণিপুর হয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সাথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পথ, সে রাজ্যের খনিজ এবং বনজ সম্পদ ও জমির ওপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানার বদলে বৃহৎপুঁজিদের কর্পোরেট কোম্পানির মালিকানার থাবা বসাতে সুবিধা হবে। অন্যদিকে সরকারি দলের পক্ষে এক একটি গোষ্ঠীর ত্রাতা সেজে তাদের ভোট কেনার সুযোগ আসবে।

বিভাজনের রাজনীতি সমস্যা বাড়াচ্ছে

এসটি সংরক্ষণের প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জনগোষ্ঠীগুলির পরিচিতির সংকট (আইডেন্টিটি ক্রাইসিস)-কে। আদিবাসীদের মধ্যে একদল সুযোগ-সন্ধানী প্রচার করছে, উপত্যকাবাসী এবং রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইরা এমনিতেই তোমাদের থেকে বেশি অগ্রসর। রাজ্যের ৬০ সদস্যের বিধানসভায় তারাই ৪০ জন। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা প্রভাবশালী। ফলে তারা এসটি তালিকায় এলে জনজাতিরা সব হারাবে।

অন্যদিকে মেইতেইদের মধ্যে প্রচার হয়েছে, কুকি, জো, চিন ইত্যাদি জনজাতির লোকেরা দলে দলে মায়ানমার বা ভারতেরই অন্য রাজ্য থেকে এসে মণিপুরের অধিকাংশ জমি দখল করে নেবে। তাতে মেইতেইদের গরিষ্ঠতা ধাক্কা খাবে। এসটি হতে পারলে তোমরাও পাহাড়ে জমি কিনতে পারবে। কারণ আইন অনুসারে মণিপুরে তফশিলি জনজাতিদের জমি তারা ছাড়া অন্য জনগোষ্ঠীর কেউ কিনতে পারে না। মণিপুরে পার্বত্য এলাকা এবং বনাঞ্চল ৯০ শতাংশ, উপত্যকা মাত্র ১০ শতাংশ। এই উপত্যকাতেই ৫৩ শতাংশ লোকের বাস। ফলে আরও জমি পেলে তোমাদের উন্নতি হবে। প্রচার হচ্ছে, এসটি তালিকাভুক্ত হলে চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দরজা মেইতেইদের জন্য হাট করে খুলে যাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের অধিকাংশ নেতাই মেইতেই জনগোষ্ঠীভুক্ত। তাঁদের একপেশে এবং সাম্প্রদায়িক ভূমিকা নানা অংশের মানুষের মধ্যে বৈরিতা বাড়াতেই সাহায্য করেছে।

রাজ্য প্রশাসন এতটাই পক্ষপাতদুষ্ট যে, জনজাতিভুক্ত এক বিজেপি এমএলএ আক্রান্ত হলেও রাজ্যের পুলিশ বাহিনী প্রায় দর্শক হয়েই থেকেছে। বিজেপির কিছু নেতা মেইতেইদের হিন্দু এবং জনজাতিদের খ্রিস্টান হিসাবে দেখিয়ে এই সংঘর্ষে ধর্মীয় রং দিতে চেয়েছেন। এর ফল হচ্ছে মারাত্মক। মণিপুরের পাহাড় থেকে নির্বাচিত এমএলএ-দের মধ্যে থেকেই পাহাড়ে আলাদা প্রশাসনের দাবি উঠছে। ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরও জোরদার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সাতের পাতায় দেখুন

মণিপুরে আর্তদের চিকিৎসায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

ইনসেটে রক

থাউবল

ট্রাম তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে পরিবহন দফতরে বিক্ষোভ

১ জুন দলের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে ধর্মতলা ট্রাম ডিপো থেকে শুরু হয়ে প্রায় এক হাজার মানুষের একটি মিছিল পরিবহন দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দাবি ছিল, গণপরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ট্রাম তুলে দেওয়া চলবে না। পরিবেশবান্ধব, সস্তা, ঝুঁকিহীন এই যান ছাত্রছাত্রী, মহিলা, রোগী সহ বয়স্ক মানুষের অত্যন্ত উপযোগী। তবু রাজ্য সরকার এই ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারের অজুহাত, ট্রাম ধীর গতির এবং যানজটের কারণ।

একটি ট্রামের গড় আয়ু ৬০-৭০ বছর।ট্রামের রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিবহন খরচ নামমাত্র এবং তা দূষণহীন। অন্য দিকে একটি সরকারি বাসের গড় আয়ু ৫-৮ বছর। ব্যাটারি চালিত যে বাসগুলি এখন চলে তার দাম কোটি টাকার বেশি এবং শুধু ব্যাটারির দাম ৬০-৭০ লক্ষ টাকা, যার গড় আয়ু মাত্র ২ বছর। কলকাতার রাস্তা জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। তাই শহরকে বাঁচাতে যখন দরকার ছিল আরও বেশি গণপরিবহনে জোর দেওয়া তখন অটোমোবাইল ব্যবসায়ীদের চাপে কিছু অসাধু আমলা ও মন্ত্রী-নেতা ট্রাম পরিষেবাকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সিপিএম সরকারের জমানায়, নব্বইয়ের দশকে ট্রাম কোম্পানি বাস নামিয়ে এবং টালিগঞ্জ ডিপোর জমি আবাসন ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল, আজ তৃণমূল সরকারের আমলে পুরো ব্যবস্থাটিকেই তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সেই ষড়যন্ত্র পূর্ণ হচ্ছে।

সবারই জানা, ট্রাম লাইনের উপরে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইক, অটো, রিক্সা বা সরকারি-বেসরকারি অকেজো বাস দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বহু ক্ষেত্রে লরির লোডিং, আনলোডিং চলে পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে। রাস্তার দুদিকে ট্রাম লাইন পর্যন্ত পার্কিংয়ে ঠাসা। তবু ট্রাম নাকি যানজটের কারণ!

এ দিন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় পরিবহন মন্ত্রী স্বীকার করেন, কিছু রুটে সরকার ট্রাম চালাতে চাইলেও ট্রাফিক পুলিশের বাধায় তা কার্যকর করা হচ্ছে না। কী অদ্ভুত যুক্তি, জনগণের ভোটে যে সরকার নির্বাচিত হয় তার পরিচালক তবে কি ট্রাফিক পুলিশ? আমাদের দল মনে করে পুলিশ-কর্পোরেশন ও কিছু নেতা-মন্ত্রীর অশুভ আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই গণপরিবহন ব্যবস্থা আমাদের রক্ষা করতেই হবে। তা না হলে পরিবেশ সহ দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের বিপদ আরও বাড়বে। প্রতিনিধিদল মন্ত্রীকে জানান, নাগরিকরা ট্রাম চালুর পক্ষে। প্রতিদিন মহানগরীর রাজপথে দলের উদ্যোগে যে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে তাতে স্বাক্ষর দিয়ে এই মত তাঁরা জানিয়ে চলেছেন। তাই ট্রাম তুলে দেওয়ার অর্থ জনমতের বিপক্ষে যাওয়া। মন্ত্রী আপাতত কিছু রুটে ট্রাম চালু করার কথা জানান।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কিসান প্রধান। কমরেড গৌড়ী বলেন, সরকার ট্রাম রুটগুলি দ্রুত চালু না করলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।

এস ইউ সি আই (সি)-র বড় হওয়ার পদ্ধতি অন্যদের থেকে আলাদা

আমাদের দলের বড় হওয়ার পদ্ধতির সাথে অন্যান্য দলের বড় হওয়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। তারা সংগঠন বাড়াচ্ছে শাসক দলের সুবিধা নিয়ে। সব সংসদীয় দলই এটা করে। শাসন ক্ষমতায় থাকবার সুযোগ নিয়ে, তার সুবিধা নিয়ে তারা দলবল বাড়ায়। আমরা এ ভাবে ভাবি না। আমাদের বড় হবার নীতিটা আমরা অন্য ভাবে ভাবছি। আমরাও বড় হতে চাই, বড় হচ্ছি, কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে। শ্রমিক-চাষিদের কমিটিগুলো গঠন করে গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রামের পথে কর্মী তৈরি করতে এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব তৈরি করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। গণসংগঠনগুলোর মধ্য থেকে, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্য থেকে কর্মী তৈরি করে, আমরা নেতৃত্বে নিয়ে আসবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি যাতে চাষির ঘর থেকে, শ্রমিকের ঘর থেকে কর্মী তৈরি করা যায়, নেতৃত্ব তৈরি করা যায়। ...

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

এই পরিস্থিতিতে আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আলোচনার মধ্য দিয়ে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়ে দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, বিপ্লবই আসলে বিকল্প। কিন্তু বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী পার্টি চাই। আর কার কত শক্তি, তাই দিয়ে বিপ্লবী পার্টি বিচার করতে যাবেন না। কারণ, অবিপ্লবী পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি হয়। না হলে মুসলিম লিগের শক্তিবৃদ্ধি হত না, জনসংঘের শক্তিবৃদ্ধি হত না, সভ্যতার চরম শত্রু হয়েও হিটলারের পার্টি গোটা জার্মানিকে তার পেছনে জড়ো করতে পারত না। শুধু মালিকদের সমর্থনে এটা হয় না। কারণ দেশে মালিকরা আর ক'জন? জনসাধারণ সমর্থন না করলে তাদের শক্তি টেকে কী করে, বাড়ে কী করে? জনগণ বহু কারণেই তাদের সমর্থন করতে পারে ও করে, যদি না সত্যিকারের বিপ্লবী চেতনা তাদের মধ্যে দেওয়া যায়। তাই আপনাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বুঝতে হবে, বিপ্লবী পার্টি বুঝতে হবে, বুঝতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হল একমাত্র হাতিয়ার।

এই বিজ্ঞানটা আয়ত্ত করতে পারলে, তার প্রয়োগ কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনারা জনগণকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক বোঝাতে পারবেন। আপনারা বোঝাতে পারবেন যে, মার্কসবাদের নামে বাকি পার্টিগুলো শুধুমাত্র শব্দগত পার্থক্য ছাড়া একই কথা বলে কী ভাবে জনগণকে ঠকাচ্ছে। এ জিনিস বুঝিয়ে এইসব দলের প্রভাব থেকে জনগণকে তখনই আপনারা মুক্ত করতে পারবেন, যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যথার্থভাবে আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন।

তা ছাড়া আমাদের দল সঠিক কি না, সঠিক হলে কী ভাবে সঠিক এবং বিপ্লবকে আমরা কী ভাবে দেখছি এবং কী ভাবে করতে হবে, সেটা বুঝতেপারবেন এবং সেইভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় ভারতের পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব

পঞ্চম খণ্ড, শিবদাস ঘোষ রচনাবলি

সোনারপুরে বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি সহ দশ দফা দাবিতে ১৮ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সোনারপুর ব্লকের গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে সারা বাংলা আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১২২ জন আশাকর্মী বিক্ষোভ দেখান।

পরে তাঁরা বিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন দেন। বিএমওএইচ প্রত্যেকটি দাবির যৌক্তিকতা মেনে নেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এবং মিনতি মিত্র।

আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের পাশে রাজ্যের মানুষ

বার্নিয়াতে মিছিল ছাত্র-যুবদের ঃ ২৮ মে সাক্ষী মালিকসহ আন্দোলনকারী কুস্তিগিরদের উপর দিল্লি পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে, অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও নদীয়া উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১ জুন প্রতিবাদ দিবস পালিত হয় বার্নিয়া বাজারে।

উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সেলিম মল্লিক, এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম সহ প্রমুখ।

আসানসোলে সংহতি মিছিল ঃ মহিলা কুস্তিগিরদের উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদ করে এবং তাদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ৩১ মে আসানসোলের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদসভা এবং সংহতি মিছিল আয়োজিত হয়েছিল।

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে মানববন্ধন ঃ দিল্লিতে মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তা এবং পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১ জুন ডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের আহ্বান করা হয়েছিল। তার অঙ্গ হিসেবে কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ও অন্য নেতা-কর্মীরা।

এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির মোড়ে মানববন্ধন। ১ জুন

প্রধানমন্ত্রীকেই দায় নিতে হবে

একের পাতার পর

যে মনঃসংযোগ দরকার, অতি পরিশ্রমের ফলে বহু সময়ই তা ব্যাহত হয়।

গত বছর অনেক শোরগোল তুলে রেলমন্ত্রী অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম বা 'কবচ' ব্যবস্থা চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর থেকে সরকার ক্রমাগত এমন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যাতে যে কারও মনে হবে দেশের গোটা রেল ব্যবস্থাটাই বোধহয় এই নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। বাস্তবে প্রায় ৭০ হাজার কিলোমিটার রেল লাইনের এখনও মাত্র এক হাজার কিলোমিটারেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনগুলির কোনওটিতেই সেই কবচ

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট

নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। থাকলে হয়তো এতগুলি মানুষের প্রাণ এমন বেঘোরে চলে যেত না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন যুদ্ধকালীন দ্রুততায় পুরো রেল ব্যবস্থায় এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হল না?

রেল কর্তারা রুটিন মাফিক উত্তর দিয়েছেন, অর্থাভাবেই তা করা যায়নি। সত্যিই কি অর্থাভাব? প্রথমত, ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও ভারতীয় রেল একটি লাভজনক সংস্থা। দ্বিতীয়ত, করোনার সুযোগ নিয়ে সরকার রেলে যাত্রীদের থেকে বহু সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। যেমন, প্রবীণ যাত্রীরা যে সুযোগ পেতেন তা বন্ধ করে দিয়েছে এবং নির্লজ্জের মতো তার ফলে কত টাকা বাঁচাতে পেরেছে তা ফলাও করে প্রচার করেছে। গত কয়েক বছরে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম দ্বিগুণ করেছে। বহু প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে সুপারফাস্ট নাম দিয়ে কয়েক গুণ ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়াও ডায়নামিক প্রাইসিংয়ের (তৎকাল / প্রিমিয়াম তৎকাল) নাম করে যাত্রীদের থেকে যথেচ্ছ টাকা আদায় করে চলেছে রেল। এই টাকা কোথায় যাচ্ছে?

রেল ব্যবস্থার অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য নাকি টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বহু পুরনো ট্রেন বদলানো হয় না, ভাঙাচোরা কামরাগুলি বদলানো হয় না, সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় না, লাইনগুলির নিয়মিত নজরদারি, ওয়েলডিংয়ের কাজ ব্যাহত হয়। এর ফলে বালেশ্বরের মতো এত বড় দুর্ঘটনা নিয়মিত না ঘটলেও ছোটখাটো দুর্ঘটনা অজস্র ঘটে চলেছে। গত এক বছরে ৪৮টি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে রেলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আবার তেমন বড় ক্ষতি না হওয়া দুর্ঘটনার পরিমাণ ছিল ১৬২টি। যখনই কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটে, মন্ত্রীরা দুঃখ দুঃখ মুখ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং একটি তদন্ত কমিশন ঘোষণা করেন। তারপর কোনও দিন হয়তো তদন্তের রিপোর্ট বের হয়, কখনও হয়তো তা-ও হয় না। হলেও সেই রিপোর্ট কোনও এক ফাইলে বন্দি হয়ে থাকে। তারপর সব কিছু যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকে।

যাত্রী নিরাপত্তায় টাকা নেই, অথচ প্রধানমন্ত্রী '২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই দুশোটি শহরের মধ্যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল বন্দে ভারত চালানোর যে ঘোষণা করেছেন তার জন্য টাকার কোনও অভাব হচ্ছে না। কারণ সেগুলি প্রধানমন্ত্রীর মহান কীর্তি হিসাবে প্রচারিত হচ্ছে। এই বন্দে ভারত কাদের জন্য? অন্তত সাধারণ মানুষের জন্য তো নয়। এই ট্রেনের ভাড়া সাধারণ এক্সপ্রেস ট্রেনের থেকে ৫ গুণ বেশি। এই ট্রেনের বিশেষত্ব কী? এতে যাত্রীরা নাকি দারুণ রকমের গতি, আরাম এবং সুবিধা পাবেন। ট্রেনের গতি নাকি ১৬০-১৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, বাস্তবে ট্রেনগুলি চলছে ৭০ কিমি গতিবেগে। কারণ আলাদা কোনও লাইনে নয়, পুরনো লাইনেই চলছে ট্রেনগুলি। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, নতুন চালু করা কোনও বন্দে ভারতে এসি কাজ করছে না, কখনও প্রয়োজনীয় জল থাকছে না, কখনও পচা কিংবা বাসি খাবার দেওয়া হচ্ছে। আর বুলেট ট্রেন তো প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন! সেই স্বপ্নে বুঁদ হয়ে না থেকে প্রধানমন্ত্রী যদি দেশের সিংহভাগ মানুষ যে সব ট্রেনে নিত্য যাতায়াত করেন, সেগুলিতে মানুষের সুস্থভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেন তবে প্রচারের কৃত্রিম আলো টানার জন্য তাঁকে এত ফিকির খুঁজতে হত না, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তাঁর প্রশংসা করতেন। কিন্তু তিনি তো দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নন যে তাদের সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যাকুল হবেন! বরং ধনী, পুঁজিপতি, শিল্পপতিদের জন্য আরও কত বেশি আরামে

দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি

যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্যই তো তিনি দায়বদ্ধ। তাই প্রধানমন্ত্রী বুলেট ট্রেনের স্বপ্নে, বন্দে ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন, আর খেটে-খাওয়া গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষ দলে দলে প্রাণ দিয়ে, পরিবার-পরিজনকে পথে বসিয়ে সেই স্বপ্নের মূল্য চোকায়। ধরায় কীর্তি রেখে যেতে হবে যে!

প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে বলেছেন, দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। রেলমন্ত্রী

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর

আরও কয়েক পা এগিয়ে অনতিবিলম্বেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি নয়, কিছু কর্মচারীই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং তাঁদের নাকি ইতিমধ্যে চিহ্নিতও করা হয়ে গেছে। হয়তো এ বার নীচের তলার কিছু কর্মীকে বলির পাঁঠা করা হবে নিজেদের গাফিলতি, অপদার্থতা এড়াতে— ওপরতলার লোকেরা চিরকাল যেমন করে এসেছে। মেন লাইনে যাওয়ার জন্য সিগন্যাল সবুজ হয়ে থাকলেও, পয়েন্ট-এর (যার মাধ্যমে ট্রেন লাইন পরিবর্তন করে) অভিমুখ যে লুপ লাইনের দিকে খোলা থাকতে পারে, এমন বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা জানিয়ে চার মাস আগে সতর্ক করলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। তাই দোষী তো শুধু কয়েক জন কর্মীই নয়, স্তরে স্তরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শাস্তি হবে না কেন? সরকারের যে ব্যয়সঙ্কোচ এবং বেসরকারিকরণের নীতির জন্য আজ অর্থাভাবের অজুহাত তুলে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয় না, লাইনগুলির সংস্কার হয় না, নিরাপত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না, উপরতলার সেই নীতিকারদের চিহ্নিত করা হবে তো? যাঁরা সাধারণ ট্রেনগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চরম অবহেলা করে বন্দে ভারতকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে না কেন? তা যাতে না করতে হয় তার জন্যই কি তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী? বন্দে ভারত চালুর কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী যদি একাই দাবি করেন তবে এই দুর্ঘটনার দায়ও তো তাঁকেই নিতে হবে। পদত্যাগ করলে মৃত মানুষগুলির প্রাণ ফিরবে না, কিন্তু নৈতিক দায় বলে কিছু থাকলে তা কেন নেবেন না রেলমন্ত্রী? কেন সেই দায় মাথায় নিয়ে তিনি পদত্যাগ করবেন না?

তা হলে শুধুই কি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া রেল কামরাগুলিতে পচে-ওঠা মৃতদেহের চড়া দুর্গন্ধ, আহত যাত্রীদের আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠা বাতাস, প্রিয়জনকে খুঁজতে থাকা আত্মীয়দের অসহনীয় উদ্বেগ, আতঙ্কে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জল, মর্গ বানিয়ে তোলা স্কুলবাড়িতে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা সারি সারি মৃতদেহের মাঝে হঠাৎ স্বজনের দেহ খুঁজে পাওয়ার হাহাকার মানুষের স্মৃতিতে থেকে যাবে? আর বারবার করে তা আমাদের বুঝিয়ে দিতে থাকবে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের কর্তারা মানুষের ভোটে জিতে এসে মানুষেরই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, জনসাধারণের প্রাণ বাজি রেখে নিজেদের প্রাণ-মন সঁপে দেয় শুধু মুনাফাবাজ একচেটিয়া মালিকদের শোষণের পথ সুগম করতে, সে দেশের মানুষের জন্য এই অসহায় আর্তনাদ, এই নিরুপায় যন্ত্রণা ভোগই বরাদ্দ? নাকি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইব আমরা?

স্মরণে শোক

একের পাতার পর

দশার যথাযথ পরিবর্তন, আহতদের সরকারি খরচে চিকিৎসা, নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তিনি।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একদিকে ট্রেনের ভাড়া বাড়াচ্ছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির শুধুমাত্র নাম বদলে এক্সপ্রেস ঘোষণা করে বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে, অন্য দিকে যাত্রী পরিষেবা, নিরাপত্তা ক্রমাগত তলানিতে পৌঁছচ্ছে। রেলে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। এ দিকে নজর না দিয়ে সরকার শুধুমাত্র মানুষকে চমক দিতেই ব্যস্ত। এখন চলছে বন্দে ভারতের চমক। তিনি বলেন, বালেশ্বরের দুর্ঘটনা সরকারি অবহেলার পরিণতিতেই ঘটেছে।

মেদিনীপুর হাসপাতালে আহতদের পাশে দলের নেতা-কর্মীরা

বালেশ্বর দুর্ঘটনার আহত যাত্রীদের অনেককেই রক্তাক্ত অবস্থায় ৩ তারিখ দুপুর থেকেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে, এই খবর পাওয়া মাত্র এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে যান এবং এমার্জেন্সি থেকে শুরু করে একের পর এক ওয়ার্ডে ভর্তি আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। হাসপাতালে উপস্থিত সিএমওএইচ, সুপার এবং ডাঃ গোলক মাজির নেতৃত্বে সরকারি পরিদর্শক টিমের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু অভিযোগ তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে প্রতিকার দাবি করেন। তাঁরা বলেন, সরকার আহতদের যথাযথ চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে বলে প্রচার চালালেও বাড়ির লোককেই 'ওষুধ কিনে আনুন' বলে স্লিপ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে।

মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৭০ জন, তার মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন। অনেকের অবস্থা গুরুতর। প্রতিনিধি দলের কাছে নিজেদের সমস্যা তুলে ধরেন আহতরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীর রবিন নাইয়া বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশে ধান রোয়ার কাজে যাচ্ছিলাম। তাঁর তিন কাকা মারা গেছেন। প্রতিবেশী বিকাশ হালদার, সঞ্জয় হালদার ও গোপাল নাইয়া নিখোঁজ। ক্যানিংয়ের লুৎফর রহমান শেখ, বাসন্তীর নমিতা সরদার, মালদার গোষ্ঠনগরের নরেন চৌধুরীর অবস্থাও একই। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার যাটোর্ধ্ব উত্তম মান্না বাঙ্গালোরে বস্তা সেলাই কারখানায় কাজ করেন,

আটের পাতায় দেখুন

হোসিয়ারি শ্রমিকদের বিক্ষোভ কোলাঘাটে

সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে হোসিয়ারি শ্রমিকদের রেটবৃদ্ধি, পরিচয়পত্র প্রদান, পিএফ-ইএসআই চালু সহ পাঁচ দফা দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্টবেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের কোলাঘাট ব্লক কমিটির আহ্বানে ২ জুন বিডিও এবং শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ও বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদক নেপাল বাগ, শ্যামল মণ্ডল, নব শাসমল প্রমুখ। জয়েন্ট বিডিও এবং শ্রম দপ্তরের নূন্যতম মজুরি পরিদর্শক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দার্জিলিঙে গণঅবস্থান

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২ জুন রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহের অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়ির হাসমি চকে গণঅবস্থান। বক্তব্য রাখছেন পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য

তৃণমূল সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা শুরু করল

দুয়ের পাতার পর

জোর দিয়েছে। ৫০ শতাংশের বেশি পড়ুয়াকে সেই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করবে বলে সরকার পরিকল্পনা করেছে। এমনকি ১০০ শতাংশ অনলাইন শিক্ষাভিত্তিক স্নাতক ডিগ্রি প্রদানের কলেজও তাঁরা খোলার অনুমতি দিচ্ছেন। কম্পিউটার-ল্যাপটপ-স্মার্টফোন-ইন্টারনেট-অ্যাপ ভিত্তিতে এই শিক্ষা প্রদান করা হবে। এখানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে না, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি তৈরি করতে হবে না, শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে না। 'ব্লেন্ডেড' ব্যবস্থায় ক্লাস নেওয়ার দায়িত্বও শিক্ষকদের থাকবে না, তাঁদের লেকচার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে, পড়ুয়ারা তা ডাউনলোড করে শুনে নেবে। একবার লেকচার আপলোড করলে তা কয়েক বছর থাকবে। তখন আর শিক্ষকের প্রয়োজন হবে না। এই ব্যবস্থায় নতুন শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব কমে যাবে। ফলে সরকারের আর্থিক দায়িত্ব লঘু হবে। বিত্তশালীরা ছাড়া অন্যরা এই শিক্ষার নাগাল পাবে না। যদি কম্পিউটার-ল্যাপটপ-স্মার্টফোন সবার থাকেও, তাতেও কি আমরা দীর্ঘদিনের প্রচলিত ও সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণি-কক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষাকে বিকল্প হিসাবে বেছে নিতে পারি? অনলাইন শিক্ষা শ্রেণি-কক্ষ ভিত্তিক মূলধারা শিক্ষার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা তার বিকল্প হতে পারে না। 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,'মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে ... প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ... গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষা কার্য সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলিতে পারে। যে অনলাইন শিক্ষার ওপর এই নীতি জোর দিয়েছে তাতে প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রই হল 'গুরু' বা শিক্ষক। প্রশ্ন হল যন্ত্র কি কিশোর মনে 'প্রাণ সঞ্চার' করবে? 'গুরু-শিষ্যের আত্মীয়তার' সম্পর্ক গড়ে তুলবে? তাদের মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাবে? মননশীলতা সৃষ্টি করবে? না যন্ত্র কেবল যন্ত্রবৎ বা 'রোবোটিক' কিছু মানুষের জন্ম দেবে? একদিকে অতীত যুগের গুরুকুল ব্যবস্থা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা উল্লেখ করে ঐতিহ্যের বড়াই করা ও হিন্দুত্ববাদের উস্কানি দেওয়া, অন্যদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানসিক সংযোগবিহীন শুধুমাত্র প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় জোর দেওয়া— সীমাহীন দ্বিচারিতা ছাড়া কিছুই নয়। কম্পিউটার ইত্যাদি কেনার আর্থিক সামর্থকে ভিত্তি করে যে 'ডিজিটাল ডিভাইড' তার ফলে দু'ধরনের ছাত্রেরও সৃষ্টি হবে। আবার ১৩৭ কোটির দেশের ছাত্রসমাজকে যদি ল্যাপটপ-স্মার্টফোন কিনতে, আম্বানিদের মতো ব্যবসায়ীদের 'ডেটা' সিম ব্যবহার করতে, কর্পোরেট সৃষ্ট নানা কিসিমের 'লার্নিং অ্যাপ' কিনতে বাধ্য করা যায় তাতে কর্পোরেট হাউসগুলির আশীর্বাদও জুটবে শাসকগোষ্ঠীর মাথায়।

পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা প্রয়োজন। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করতে গিয়ে তৃণমূল, সিপিএম সমেত সমস্ত শাসক দল যে প্রশ্ন উত্থাপন করছে তা হল, সারা দেশে ইউজিসি-র নির্দেশে যদি চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হয়ে যায় তা হলে যে রাজ্যে তা চালু হবে না, সেখানকার পড়ুয়ারা পিছিয়ে যাবে। প্রথমত, যে কোর্সের শিক্ষাগত যৌক্তিকতাই নেই, যা এতক্ষণ আলোচনা করা হল, তা না পড়লে পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার বা উক্ত দলগুলি কি এখনই জানল যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করতে যাচ্ছে? তারা জেনেছিল ২৯ জুলাই ২০২০। প্রায় তিন বছর সময় পেয়েও রাজ্য সরকারগুলি কেন কেন্দ্র বা ইউজিসি-র কাছে এই নীতির অসুবিধার দিকগুলি তুলে ধরেনি? তৃণমূল সরকার অতীতের দুটি কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে আনেনি, তৃতীয় কমিটির রিপোর্টেই সুপারিশ করে দিল, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক চলতে হবে! তৃতীয়ত, বর্তমানে প্রচলিত তিন বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্সের সীমাবদ্ধতা কোথায় ছিল, যার জন্য তাকে তুলে দিতে হবে, তা কি কেন্দ্রীয় সরকার দেখিয়েছে? তাহলে অনার্স ডিগ্রি পেতে গেলে এক বছর অতিরিক্ত পড়তে হবে কেন? সময়ের অপচয় না করে কেন তিন বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পড়িয়ে দেওয়া হবে না? তাতে তিন বছরেই অনার্স ডিগ্রির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট সংগ্রহ হতে পারত। চতুর্থত, নতুন ব্যবস্থাতেও তিন বছরের স্নাতক কোর্স থাকছে, তা সম্পূর্ণ করলে দু'বছরের স্নাতকোত্তর পড়া ও তারপর ডক্টরেট ডিগ্রি করার সুযোগ থাকছেই। তাহলে কেবল অনার্সের কথা বলে একজনকে অতিরিক্ত এক বছর পড়তে হবে কেন? এ প্রশ্নগুলো কি তৃণমূল, সিপিএম বা অন্য শাসকদলগুলো ইউজিসি-কে করেছে? নাকি সেই দায় এড়িয়ে গিয়ে কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে শিক্ষার সর্বনাশের পথই প্রশস্ত করছে?

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স শিক্ষায় বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা সুগম করবে

আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের তত্ত্বটি মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা থেকে নকল করেছে এবং তা করার আগে একবারও ভেবে দেখেনি যে তা এদেশের জন্য উপযুক্ত কিনা। অন্যদিকে এদেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলার যে ব্যবস্থা তারা করছে, তাতে ভর্তির জন্য চার বছরের স্নাতক ডিগ্রিধারী পড়ুয়া লাগবে। অর্থাৎ শিক্ষায় 'ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট' বা সরাসরি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তাকে মসৃণ করার ব্যবস্থা তারা করছে। অথচ এই শিক্ষানীতির ছত্রে ছত্রে তারা ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও তার শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করেছে। কাজেই, এই শিক্ষানীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত বলে বিজেপি সরকার যতই বড়াই করুক, বাস্তবে ভারতের পরিবেশ-পরিস্থিতি, পরিকাঠামো এবং সর্বোপরি ভারতীয় ছাত্রসমাজের স্বার্থের কথা না ভেবে শুধুমাত্র ব্যবসার স্বার্থে বিদেশ থেকে সুবিধামতো কপি-পেস্ট করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। তৃণমূল সরকারও কেন্দ্রবিরোধী নানা স্লোগান দিতে দিতে বিজেপি সরকারের এই নির্লজ্জ পদক্ষেপকেই কার্যত বিনা বাক্যব্যয়ে সমর্থন করল।

রাজ্য জুড়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। বিশেষ করে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটি লাগাতার প্রতিবাদে সামিল হয়েছে এবং ১৭ জুন কলকাতায় এর বিরুদ্ধে কনভেনশনের ডাক দিয়েছে। এস ইউ সি আই (সি) ১-৭ জুন সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করেছে। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেছেন, যে ব্যবস্থা তারা চালু করতে চাইছে তাতে স্নাতক স্তরের শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হবে এবং শিক্ষা-বিবর্জিত স্নাতক তৈরির কারখানায় পর্যবসিত হবে বর্তমান কলেজগুলি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যতও অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে আলোচনা সভা

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর মাঝেরপাড়া প্রাইমারি স্কুলে ২৫ মে এক কর্মীসভায় এই মহান বিপ্লবীর জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষা নিয়ে চর্চা হয়। মূল আলোচক ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের বসিরহাট জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন ও স্বরূপনগর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা।

মুর্শিদাবাদে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পরিচালনায়, পিএমপিএআই ও বহরমপুর উত্তরণ সমাজের সহযোগিতায় ২৮ মে ধোপঘাঁটি, লালদিঘি, বহরমপুর শহরে আয়োজিত হয় 'নেতাজি সুভাষ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প'। জেলার শতাধিক দুঃস্থ শিশু-মহিলা-যুবক ও বৃদ্ধ রোগীর চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গোলাম সারওয়ার, ডাঃ রবিউল আলম সহ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মণিপুর ঃ শাসকরা চায় বিচ্ছিন্নতার লড়াই চলতে থাকুক

তিনের পাতার পর

অন্য রাজ্যের মতো মণিপুরেও বিজেপি শাসনের ওপর মানুষের ক্ষোভ প্রবল। বিজেপি চেয়েছে সরকার বিরোধী এই ক্ষোভকে দাঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে। উপত্যকার মানুষের ক্ষোভ চাপা দিতে তারা মেইতেইদের ত্রাতা সাজতে চায়। কিন্তু বিজেপি যে ভাবে মণিপুরের সমগ্র মেইতেই গোষ্ঠীকে একমাত্রিক হিন্দুত্বের নিরিখে দেখাচ্ছে, তাতে তৈরি হচ্ছে নতুন সমস্যার সম্ভাবনা। মেইতেইদের বড় অংশ হিন্দু হলেও তাদের মধ্যে উচ্চবর্ণ, ক্ষত্রিয়, এসসি, ওবিসি ইত্যাদি সম্প্রদায়গত ভাগ আছে, এমনকি বেশ কিছু মুসলিমও আছেন। সকলে এক গোষ্ঠীভুক্ত হতে চাইবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অন্যদিকে, বিজেপি এবং আরএসএস উত্তরপূর্ব ভারতের প্রাচীন লোকবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রচলিত ধর্মগুলির গায়ে উগ্র হিন্দুত্বের ছাপ লাগাতে চায়। মেইতেইদের মধ্যেও বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের পাল্টা হিসাবে প্রাচীন সানামাহি ধর্মের কথা উঠছে। বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক লাইন এ জাতীয় আরও নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিতে পারে বলে বহু সমাজবিদের আশঙ্কা।

জাতি পরিচয় নির্বিশেষে
সব সাধারণ মানুষই বঞ্চিত

সাম্প্রতিক এই হানাহানি মণিপুরের জনজীবনের গভীর সমস্যাকে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও এ দেশের মানুষ এমন পরিস্থিতিতে বাস করেন যে, সংরক্ষণের সামান্য সুবিধা পাওয়া বা না পাওয়ার প্রশ্ন যেন তাঁদের অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে। এত বছর ধরে যে সমস্ত জনজাতি সংরক্ষণের আওতায় থেকেছেন তাঁদের জীবনের কোনও একটি জ্বলন্ত সমস্যার সুরাহা কি এসটি বা এসসি সংরক্ষণের ফলে ঘটেছে? অন্যদিকে, মেইতেইরা যদি এসটি সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েও যান, তাতেও তাঁদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির কি কোনও সমাধান হবে? দিল্লির পূর্বতন কংগ্রেস থেকে শুরু করে বর্তমান বিজেপি শাসকদের আমলেও মণিপুর সহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নের নিরিখে চরম অবহেলিত থেকেছে। শিল্প, সরকারি চাকরির সুযোগ, উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারেই হাতে গোনা। এ সবের কোনও সুরাহা হবে কি?

মণিপুরের জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে। শহরাঞ্চলের দারিদ্রের নিরিখে সারা ভারতে শীর্ষে। ২০২০-২১-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী এই রাজ্যের ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি যুবদের ৪৫ শতাংশ বেকার। লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট দেখাচ্ছে কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র ৩২ শতাংশ কিছু কাজ পায় (দ্য টেলিগ্রাফ ৫.৩.২০২২)। ৩ লক্ষ ৩৫ হাজারের বেশি বেকার দীর্ঘদিন কাজ না পেয়ে অথবা কাজ পাওয়ার বয়স পেরিয়ে যাওয়ার কারণে ২০২২-এর অক্টোবরে এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টার থেকে নাম তুলে নিয়েছেন (ইম্ফল ফ্রি প্রেস ২৮.১০.২০২২)। এই রাজ্যের অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের ৬৫ শতাংশই স্বনিযুক্ত। সরকারি বা বেসরকারি মিলিয়ে নির্দিষ্ট বেতনের স্থায়ী কিংবা ক্যাজুয়াল চাকরি মণিপুরে মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ২৭.৮ শতাংশ। মণিপুরে শিল্প অতি নগণ্য, সরকারি চাকরিও খুব কম। সংরক্ষণের আওতায় থেকেও পার্বত্য জেলাগুলির আদিবাসী মানুষের মধ্যে দারিদ্র এবং কর্মহীনতার মাত্রা অতি তীব্র। তাহলে নতুন করে কোনও সম্প্রদায় সংরক্ষণের সুবিধা পেলেও চাকরি পাবেন কোথায়? মানুষের অভিজ্ঞতা বলে, কোনও জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ থাকলেও তার সুযোগ নিয়ে সরকারি চাকরি কিংবা ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সুযোগ পায় সংরক্ষণভুক্ত জনগোষ্ঠীর ধনী এবং প্রভাবশালী পরিবারের হাতে গোনা কয়েকজনই। তাই চাকরিই যেখানে নেই, তার সংরক্ষণ নিয়ে দুই দল শোষিত মানুষের মধ্যে লড়াইতে কাদের লাভ হচ্ছে? বিবদমান জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় তা ভাবতে হবে। গণদাবীর পাতায় আমরা বারে বারেই দেখিয়েছি— সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা বা না থাকা দিয়ে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, শিক্ষাহীনতা, সমাজিক বৈষম্যের সমাধান কোনও ক্ষেত্রেই হয় না। কিন্তু এই নেই-রাজ্যের দেশে যদি কিছু সুযোগ বাড়ে— এই আশায় এখন ভারতের নানা জায়গাতে একাধিক জনগোষ্ঠী নানা ধরনের সংরক্ষণ চেয়ে বিশেষত এসটি তালিকায় প্রবেশের জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও কুড়মি বা মাহাতো জনগোষ্ঠীর মানুষ একটানা কয়েকদিন রেল অবরোধ করে এসটি তালিকায় প্রবেশের দাবিকে সামনে আনতে চেয়েছেন। তাঁদের এই দাবির পাল্টা বিরোধিতা করেছে আদিবাসী সংগঠনগুলি। এই নিয়ে একটা সংঘাতের পরিস্থিতিও তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। অথচ দুই জনগোষ্ঠীরই শোষিত মানুষের সমস্যা যে এক, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি? একই রকমের দাবি উঠছে রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা সহ ভারতের নানা রাজ্যে। তা নিয়ে রক্তাক্ত হানাহানিও হচ্ছে।

অবৈজ্ঞানিকভাবে আন্তর্জাতিক ও রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ সীমানা নির্ধারণ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে। মিজোরাম, মণিপুরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির নানা শাখার মানুষ পাশের দেশ মায়ানমারেও আছেন। তাঁদের মধ্যে আদানপ্রদানও আছে। এ জন্য কোনওমতেই মণিপুরের সমস্ত কুকি, জো, চিন, জোমি জনগোষ্ঠীর মানুষকে বহিরাগত বলা চলে না। অনুপ্রবেশ যদি কিছু হয়ে থাকে তা রুখতে এবং শরণার্থীদের নিজের জায়গায় পাঠানোর আইনি পথ সরকার নিতে পারে। তার জন্য অত্যাচারের রাস্তা নিতে হয় না। দরিদ্র জনজাতিদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিলে ভারত সরকার এই সমস্যা অনেকটাই মেটাতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই এই দায় নেয় না।

প্রান্তিক মানুষের 'পরিচিতির সংকট'
পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি

নানা কারণে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জনজাতিগুলির সাথে সমতলের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মেলামেশা আদানপ্রদানের ফাঁক থেকে গেছে। যেটা উত্তরপূর্বের নানা অংশে একটা পরিচিতির সংকট হিসাবে দেখানো হয়। এই অংশের মানুষ নিজেদের মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অনুভব করেন। এর কারণ অনেকাংশে আছে এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতার মধ্যে। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাধান্য বিস্তারকারী গান্ধীবাদী আপসমুখী ধারার নেতাদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রাধান্য ছিল। তাঁদের মধ্যে থাকা ভাষাগত, জাতিগত প্রশ্নে উচ্চবর্ণজাত আভিজাত্য, অহংবোধ ও মানসিকতা জনজাতিভুক্ত মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যোগ দিতে বাধা দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরেও উত্তরপূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নতির দিকে কোনও সরকারই নজর দেয়নি। ফলে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা বোধ নিয়েই এই অঞ্চলের মানুষ থেকেছেন। একে ব্যবহার করে একদল সুযোগ সন্ধানী নেতা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য পৃথকতাবাদী শক্তিগুলোকে মাথা চাড়া দিতে সাহায্য করে। একসময় কংগ্রেস সরকার উপত্যকা এবং পাহাড়ের জনগোষ্ঠীর কিছু প্রভাবশালী অংশকে খুশি রেখে বাকি জনগণের ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে উত্তর-পূর্বকে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল। বিজেপিও একই কায়দা নিয়েছে।

এই অঞ্চলের একদল প্রভাবশালী সম্পত্তিবান মানুষ দিল্লির শাসকদের ছায়ায় থাকতে কেন্দ্রে যে সরকার আসে তাদের দিকেই ঢলে পড়ে। এই প্রভাবশালীদের জোরেই কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলই সাধারণত মণিপুরে বিধানসভা ভোটে জিতে সরকার গড়ে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত মনোভাব প্রতিফলিত হয় না। যে কারণে মণিপুরের পাহাড়ে এবং উপত্যকাতেও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শাসকদের ওপর মানুষের ক্ষোভ আছে। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের প্রকৃত দাবিগুলি না শুনে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক বাহিনীর হাতে যথেচ্ছ স্বৈরাচারী ক্ষমতার 'আফস্পা' আইন তুলে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে মণিপুরের পাহাড়ে যেমন মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে পৃথক হতে চেয়েছে, তেমনই উপত্যকাতেও তা হয়েছে। শর্মিলা চানুর অনশন-আন্দোলন, মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহিলাদের আন্দোলন এ সবই ঘটেছে মণিপুরের উপত্যকায়। বিজেপি আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে সে সত্য বোধহয় ভুলে যেতে চাইছে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একদিকে যেমন খেটে খাওয়া মানুষের ওপর শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির দমন পীড়ন থাকে, একই সাথে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর দাপট দেখানোর চেষ্টা থাকে দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আপসমুখী ধারা প্রধান হয়ে ওঠার ফলে এ দেশে জাতিগঠনের মধ্যেই দুর্বলতা থেকে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে ভারত এক হলেও ভাষাগত, জাতিসত্তাগত, উপজাতিগত, প্রাদেশিক এমন কি এক প্রদেশের মধ্যেও নানা এলাকার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থেকে গেছে। মাঝে মাঝেই তা ফেটে পড়তে চায়। শাসকরাও উস্কানি দেয় খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য ভাঙার জন্য। মণিপুর সহ সমগ্র ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে বুঝতে হবে প্রান্তিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ, তাদের 'পরিচিতির সংকট' আসলে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী সৃষ্টি।

এই সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে হলে সারা দেশের খেটেখাওয়া মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের সাথে একাত্ম হওয়া প্রয়োজন। শুধু নিজের রাজ্য বা জাতিসত্তার গণ্ডি নয়, সারা দেশের শোষিত মানুষের জন্য শোষণ উচ্ছেদের লড়াইয়ের সাথে যুক্ত হতে পারার মধ্যেই আছে মণিপুরের শোষিত মানুষের মুক্তির রাস্তা।

সিউড়িতে পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ মহিলাদের

বীরভূমে সিউড়ি শহরের কাছে হুসনাবাদ গ্রামের দাঙ্গালপাড়ায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। বর্তমানে প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রামের পুকুর, কুয়ো সমস্ত কিছু শুকিয়ে গিয়েছে। এখানকার দরিদ্র মহিলারা প্রায় সকলেই পরিচারিকার কাজ করেন। পিএইচই দফতর থেকে যে সময়ে জল সরবরাহ করা হয়, সেই সময়ে তাঁরা কেউই বাড়িতে থাকেন না। ফলে জল নিতে পারেন না। কাজ শেষে দুপুরে বাড়িতে ফিরে প্রতিদিন প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল ও অন্যান্য কাজের জন্য জল বয়ে আনতে হয় তাঁদের।

নিদারুণ কষ্টকর এই অবস্থার প্রতিকারে এআইএমএসএস-এর নেতৃত্বে এলাকার মহিলারা জল সরবরাহের সময়ের পরিবর্তন, জলের ট্যাপের সংখ্যা বাড়ানো ও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে জলের ট্যাংক পাঠানোর দাবিতে ২ জুন পিএইচই দফতরে বিক্ষোভ দেখান। কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ একবাক্যে দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে তা দ্রুত কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে

কোচবিহার শহরের এন এন রোডের মা ভবানী বিড়ি চৌপথী, সিলভার জুবিলি রোড সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় গত ২৫ মে ফুটপাথ-ব্যবসায়ীদের

দোকানপাট ভেঙে দেয় প্রশাসন। ফুটপাথে জিনিস বেচে সংসার চালান যাঁরা, বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাঁদের উচ্ছেদ করা চলবে না, এই দাবিতে এসইউসিআই(সি)-র কোচবিহার শহর লোকাল কমিটির নেতৃত্বে ফুটপাথ-ব্যবসায়ীরা ১ জুন সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ওড়িশায় দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে দলের চিকিৎসকরা

এসইউসিআই (সি)-র ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত জানান, ৩ জুন করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ওড়িশা জুড়ে শোক দিবস পালিত হয়। শোকবেদিতে মাল্যদান, কালো ব্যাজ পরিধান, নিহতদের স্মরণে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

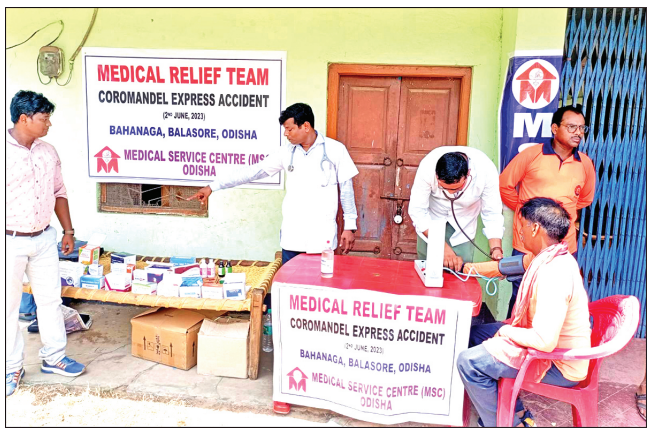

বাহানাগা স্টেশনে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে মেডিকেল রিলিফ ক্যাম্প। ৫ জুন

তিনি জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই কমরেড সদাশিব দাস, ছবি মহান্তি, প্রকাশ মল্লিক, কেদারনাথ সাহু সহ রাজ্য কমিটির ৬ জনের এক প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রতিনিধিরা বালাসোর হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার তদারকি করেন এবং বাহানাগা হাইস্কুল, যেখানে সারি সারি মৃতদেহ রাখা হয়েছে সেখানেও যান। তাঁরা ঘটনাস্থলে এবং স্কুল ও হাসপাতালে উপস্থিত স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে ঘটনার সরাসরি রিপোর্ট সংগ্রহ করেন এবং নিহত ও আহতদের পরিজনদের সমবেদনা জানান। গুরুতর আহত রোগীদের রাখা হয়েছে কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, সেখানেও যান দলের প্রতিনিধিরা।

দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রাথমিকভাবে ১৫ লক্ষ টাকা এবং আহত ব্যক্তির পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের বিনামূল্যে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও উদ্ধার ও ত্রাণকার্য সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে আহত ও আটকে পড়া যাত্রীদের জল ও খাবারের ব্যবস্থা, তাদের গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যবস্থা এবং দ্রুত সমস্ত রুটে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়।

ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সদস্যরা ৩ জুন থেকে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে চলেছেন। মেডিকেল ফ্রন্টের কমরেড গণেশ ত্রিপাঠি এবং ডাঃ সংগ্রাম ব্রহ্ম বালাসোর হাসপাতালে এবং ৪ জুন ভদ্রক হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে এবং চিকিৎসারত ডাক্তারদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা আহতদের চিকিৎসার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেন, যার ভিত্তিতে আগামী কয়েক দিন চিকিৎসা পরিষেবা দেবে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। এই সংগঠন চিকিৎসা এবং সাহায্যের জন্য রিলিফ ফান্ড সংগ্রহের আবেদনও জানিয়েছে।

৫ জুন মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস এবং এআইডিএসও-র প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থল এবং নিকটবর্তী গ্রাম ও হাসপাতালে যান। ওই দিন একটি বড় মেডিকেল টিম নানা হাসপাতালে যায় ও আহতদের চিকিৎসা করে। তাঁরা জানান, হাসপাতালগুলিতে শোচনীয় পরিস্থিতি, চিকিৎসার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। দলের রাজ্য কমিটি ৪ জুন এক বিবৃতিতে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সাধারণ মানুষের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

মেদিনীপুর হাসপাতালে নেতা-কর্মীরা

আহতদের সাথে কথা বলছেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ মৃদুল সরকার। ৪ জুন

পাঁচের পাতার পর

মাথায় চোট। ওষুধ কিনে আনতে তাঁর স্ত্রীকে স্লিপ ধরিয়েছিল হাসপাতাল।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ মৃদুল সরকার, পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর জেলা কমিটির সদস্য দীনেশ মেইকাপ ও লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড শীর্ষেন্দু শাসমল আহত ও তাঁদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের চিকিৎসার বিষয়ে তদারকি করেন।

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রকাশনা পড়ুন ও পড়ান

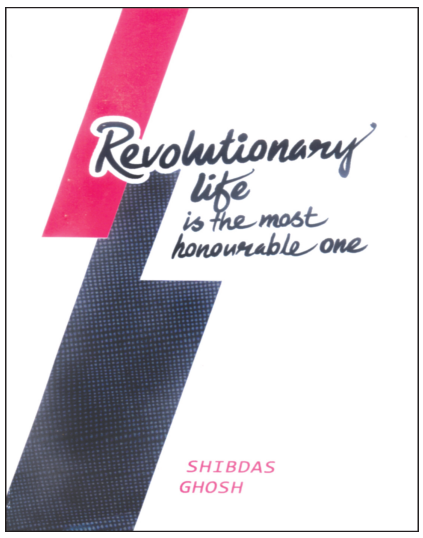

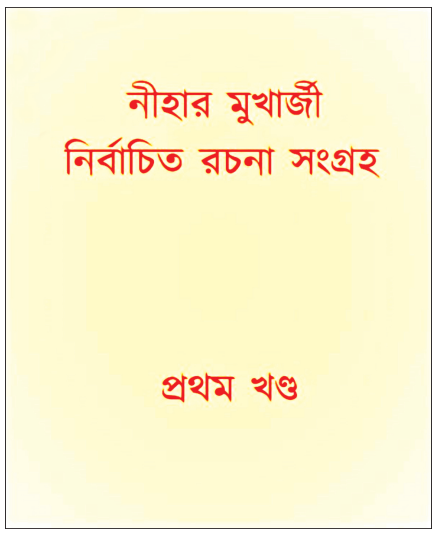

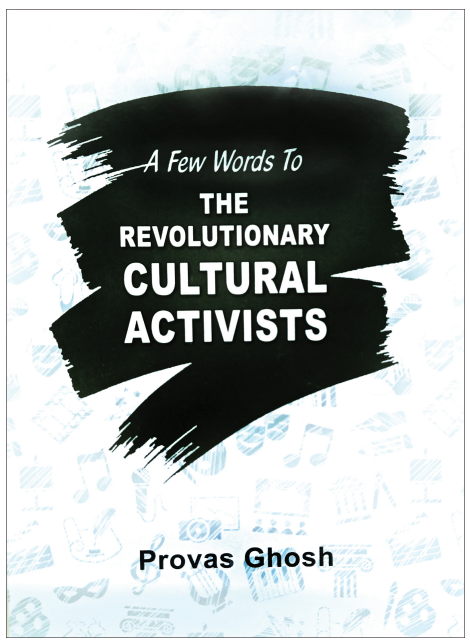

(প্রকাশিত হতে চলেছে)

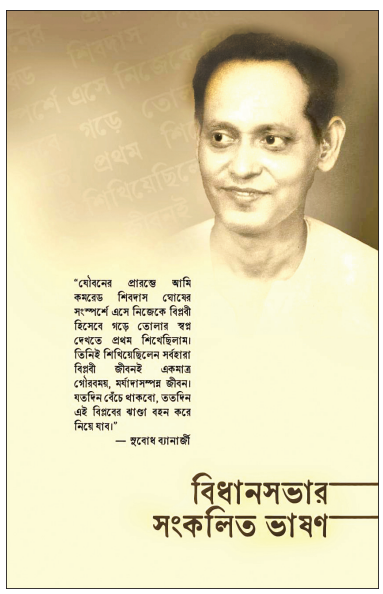

গরমের ছুটি দীর্ঘতর করে শিক্ষার উপর আঘাত হানছে সরকার ঃ এআইডিএসও

দীর্ঘ সময় গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার ঘোষণার পরেই ৩১ মে আবার ১৫ জুন পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা প্রসঙ্গে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, প্রবল দাবদাহ উদ্বেগজনক হলেও তাকে অজুহাত করে বারবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণার যে একতরফা সহজ রাস্তা মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, তাও কম উদ্বেগজনক নয়। দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী কোনও বিকল্প উপায়ের সন্ধান না করে নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত বা দলীয় বিবেচনার ভিত্তিতে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন, যা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে।

আমরা লক্ষ করলাম, দীর্ঘ ছুটির মধ্যে গরম কমলেও সরকার স্কুল খোলার কথা ভাবেনি। অথচ স্কুল খোলার নির্দেশিকা প্রকাশ হওয়ার পরদিনই মুখ্যমন্ত্রী আরও দশ দিন ছুটি বাড়িয়ে দিলেন। এতগুলি শিক্ষাদিবস নষ্ট করার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

আসলে সরকারের উদ্দেশ্য, যে কোনও উপায়ে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে তা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া। তাই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার উপর থেকে মানুষ যাতে আস্থা হারিয়ে ফেলে, নানা উপায়ে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com